কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দুর্বলতা

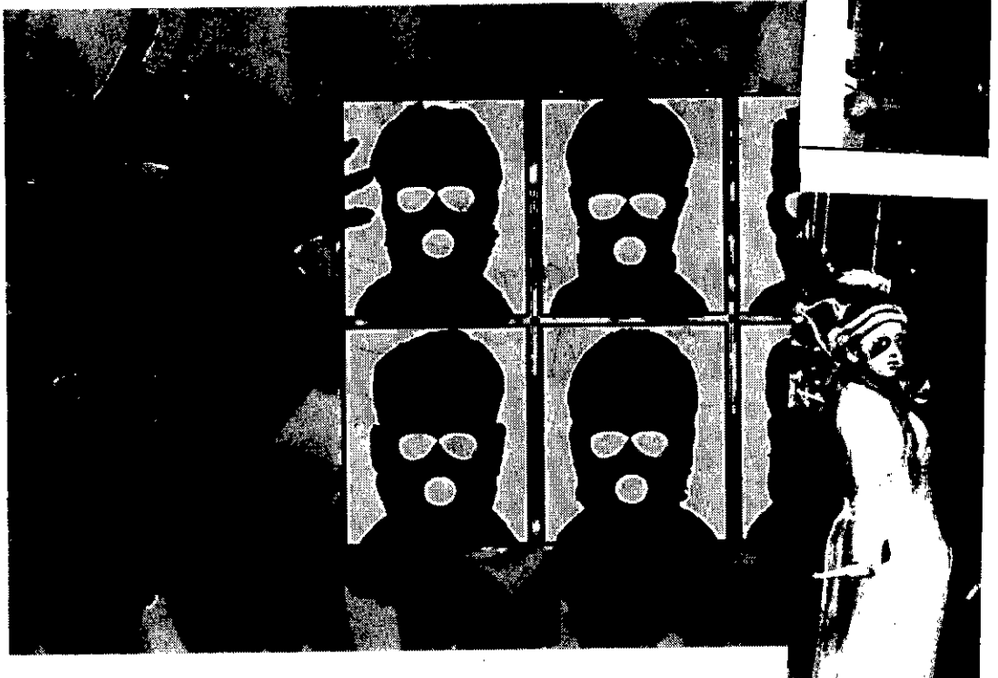

আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান নিয়ে যত কম বলা যাবে তত বোধ হয় কষ্ট ও যন্ত্রণা কম হবে। দেশে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের অধীন দুই হাজারের বেশি স্নাতক কলেজ রয়েছে। ছয় শতাধিক কলেজে নানা বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রতিবছর চার থেকে ছয় লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে কী শেখে তা কি আমরা খবর রাখি? আদৌ সেগুলোতে উচ্চতর শিক্ষার ন্যূনতম কোনো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে কি?

দেশে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় অংশ নিয়ে যারা মারা গেছে অথবা ধরা পড়েছে কিংবা যারা নিরুদ্দেশ হয়ে আছে অথবা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, তাদের সম্পর্কে জানা গেছে যে তারা সবাই কলেজ, মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী। বেশির ভাগই অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান, নামিদামি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছে। শুধু শিক্ষার্থীই নয়, জঙ্গি ভাবাদর্শে শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, তথ্যপ্রযুক্তি বা অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষিত লোকও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বা হচ্ছেন। ডাক্তার ও শিক্ষকের একটি গোটা পরিবার তো দেশে থাকা তাদের সম্পদ, চাকরি, আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে আইএসকে সেবা দিতে চলে গেছে, এমন খবরও সংবাদমাধ্যমে বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এ ধরনের অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনার খবর আমরা হয়তো এখনো জানি না। তবে শত শত শিক্ষিত তরুণের মা-বাবাকে না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়া, স্বর্গে যাওয়ার বিশ্বাসে বুঁদ হওয়ার বিষয়টি সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এখন অনেকেই পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব বা নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।

শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো, দেশপ্রেমে জাগ্রত করা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের বেশি বেশি সম্পৃক্ত করা দরকার। কিন্তু রাতারাতি খুব বেশি কিছু করার মতো লোকবল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে, কেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী বা শিক্ষিত সমাজ বলে পরিচিত অংশটি এভাবে যুদ্ধবাজ, মানববিধ্বংসী একটি জঙ্গি শক্তির প্রতি এতটা মোহগ্রস্ত হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? সে ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষাক্রমের মধ্যেই মস্ত বড় গলদ রয়েছে—এমনটি নির্দ্বিধায় বলা যায় কি? সুতরাং উত্তর খুঁজতে নজরটা বোধ হয় সেখানেই দেওয়া উচিত, শিক্ষার পরিপূর্ণ ধারণা নিয়েই কিছু ভাবা বা করা উচিত। আমাদের দেশে ঐতিহাসিকভাবে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেটি শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে সংগতি রেখে কতটা গড়ে বা বেড়ে উঠেছে তা নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে। দেশে এ পর্যন্ত কোনো শিক্ষানীতিই যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায়নি। ফলে শিক্ষার নাম ব্যবহার করে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যাঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, এগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছেন, যেসব শিক্ষাক্রম (Curriculum) ও পাঠ্যক্রম (Syllabus) অনুসরণ করা হচ্ছে, তা কতখানি শিক্ষার্থীদের বিশ্ববীক্ষা (World Vision) গঠনে সহায়ক, নাকি বিপরীতধর্মী বিশ্বাস স্থাপনে সহায়ক হচ্ছে তার কোনো তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষানীতির অনুপস্থিতিতে দেশে সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেজি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গড়ে উঠেছে—এগুলোর কোনোটিই শিক্ষাদর্শনকে জেনে বা মেনে হয়নি, চলেনি, এখনো চলছে না। ফলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যেসব শিক্ষার্থী বের হচ্ছে তারা নানা ধরনের সনদপ্রাপ্ত হলেও প্রকৃত শিক্ষা লাভে কতটা নিজেদের পরিপূর্ণ সংবেদনশীল মানুষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছে তা নিয়ে বেশ আগে থেকেই প্রশ্ন রয়েছে।

সংক্ষেপে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক দুর্বলতার কিছু দিক তুলে ধরছি। শিক্ষা নিয়ে আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধারণা মোটেও স্পষ্ট নয়, কিছু বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার মূল কাজ হচ্ছে মানুষকে জীবন-সচেতন ও কর্মদক্ষ করা। শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার হৃৎপিণ্ড। শিশু থেকে যেকোনো বয়সের শিক্ষার্থীর জীবন-সচেতনতা গড়ে তোলার বা দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক উপাদান দিয়েই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম ব্যবসা গড়ে তোলা হয়। কিন্তু আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষার এমন দর্শনের ধারেকাছেও নেই। শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি নয়, বরং বিশ্ববীক্ষা গঠনের নির্ভরযোগ্য উপায় হিসেবে ভূমিকা রাখে। মানুষের ইহকাল বা পরকাল প্রাপ্তি না প্রাপ্তির কোনো দায় শিক্ষার ওপর চাপানো যায় না। মানুষ তার জ্ঞান, বিবেক ও গঠিত চেতনাবোধ থেকেই মহৎ কাজ করার দীক্ষা পেয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষাকে দেখে থাকে প্রথমত, ইহকালে বাড়ি-গাড়ি ও অর্থবিত্ত গড়ার; দ্বিতীয়ত, পরকাল প্রাপ্তির গ্যারান্টি হিসেবে। এখান থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর উদ্দেশ্য বৃহত্তর মানুষের মধ্যে কাজ করে। আমাদের সাধারণ শিক্ষা সে কারণেই চলছে বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক ধ্যান-ধারণা থেকে; অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা পরকাল পাওয়ার বিশ্বাস থেকে। আমরা শিক্ষার লক্ষ্য, শিখন ফল ইত্যাদি না জেনে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে নীতিহীনভাবে গড়ে তুলছি, পরিচালিত করছি, তা শেষ বিচারে শিক্ষার্থীদের জীবন-সচেতন বা দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করছে না। এর ফলে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রোডাক্ট হিসেবে যারা বের হচ্ছে, তারা সমাজ, জীবন ও বিশ্ববাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে খুব বেশি সফল হয় না, তাদের বিশ্ববীক্ষাও সেভাবে গড়ে ওঠে না। ফলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। একইভাবে কর্মদক্ষতার দিকেও তারা খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারে না। উন্নত আধুনিক শিক্ষাদর্শনে পরিচালিত দেশে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যের হার থাকে ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ, বড়জোর ৫ শতাংশ অপূর্ণতা থাকে; অর্থাৎ প্রাপ্ত শিক্ষা ও শিক্ষার সনদ তারা কাজে লাগাতে পারে না এমন ডিগ্রিধারীর সংখ্যা সেসব দেশে ৫ শতাংশের বেশি খুব একটা নেই। স্কুল শিক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু-কিশোর তথা মানুষকে সচেতন ও দক্ষতায় যে পর্যায়ে উন্নীত করে, তাতে তাদের জীবনচিন্তায় ও কর্মে মুখর হয়ে উঠতে তারা কোনোভাবেই ব্যর্থ হয় না। উচ্চশিক্ষা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই নিচের দিক থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে উন্নত করে এবং গোটা দেশ ও জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিকে অধিকতর উন্নত ও গভীর করে, গবেষণা এবং উৎপাদনে দেশ, সমাজ, অর্থনীতি ও বিশ্বব্যবস্থায় অবদান রাখার জায়গাকে নিশ্চিত করে। মানুষ রক্ত-মাংসের দেহে নয়, উচ্চতর চিন্তা, ধ্যান, বীক্ষা ও সৃষ্টিশীলতায় সভ্যতা বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেটিই হচ্ছে মানুষকে রূপান্তরিত করার শিক্ষার দীক্ষা। সুতরাং উন্নত দেশগুলোর তুলনায় দৃষ্টিভঙ্গির এমন অনেক মৌলিক দুর্বলতা নিয়ে আমরা যে বিশাল শিক্ষাব্যবস্থা দেশে গড়ে তুলেছি, তা থেকে মানুষের চিন্তা-চেতনায় ও দক্ষতায় রূপান্তরের মৌলিক কাজটি সাধিত হওয়ার কোনো সুযোগ আছে, বলার কোনো ভিত্তি নেই।

এখান থেকেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বহুমুখী ধারা-উপধারার উৎপত্তি ও কার্যকর থাকার কারণ যে চলে আসছে তা বুঝতে পারলে বর্তমান শিক্ষার মৌলিক দুর্বলতা কোথায় তা বুঝে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। শিশুদের দিয়েই শুরু করি। শিশুদের মনোজগতে থাকে নতুন কিছু জানা ও করার সহজাত প্রবৃত্তি, হাজারো কৌতূহল। সেসব জানা ও ভালো লাগার ধারাবাহিক বিকাশ ঘটানোর মতো শিশুতোষ শিক্ষাব্যবস্থা শুরুতেই অনুপস্থিত। প্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাক্রম, শিক্ষক ও পঠনপাঠনে মোটেও উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে গেল তিন-চার দশকে যেসব কেজি স্কুল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গড়ে উঠেছে, এদের শিশুতোষ শিক্ষা দেওয়ার জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, লক্ষ্য কোনোটিই নেই। এরা মূলত বাণিজ্য করছে, অপ্রয়োজনীয় শিক্ষার দর্শনবিরোধী বই-পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে শিশুদের ভেতরে যে রক্তক্ষরণের সৃষ্টি করে চলছে, তার প্রতিক্রিয়া শিক্ষক, অভিভাবক ও নীতিনির্ধারক মহল বোঝার পর্যায়ে নেই। এর বাইরে ইংরেজি মাধ্যমের সংযুক্তি রক্তক্ষরণের নতুন ডাইমেনশন সৃষ্টি করেছে। ধর্ম শিক্ষার নামে তিন ধরনের মাদ্রাসায় শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশের সুযোগকে গোড়াতেই বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে মেধার উন্মেষ ঘটানোর প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় আমাদের সিস্টেম লস যে কত শতাংশে উন্নীত হচ্ছে তার কোনো ধারণাই আমাদের নেই। আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাও বহুধাবিভক্ত তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থায় চলছে। ফলে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষা শিক্ষার দক্ষতার পাশাপাশি প্রকৃতি, মানুষ, প্রাণিজগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতির বোধকে অঙ্কুরিত করার সমন্বিত শিক্ষাক্রমিক ব্যবস্থা মোটেও কার্যকর থাকছে না। এই শিশুদের জানার জগৎটা ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে, দক্ষতার অভাবও তাদের মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে দিচ্ছে। যে শিক্ষকদের হাতে এদের জীবনের এই সুন্দর পর্বটি ন্যস্ত হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ শিক্ষকই শিক্ষাজীবনে তেমন কৃতী ছাত্র ছিলেন না, শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে তাঁদের কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণা আছে বলে মনে হয় না। শিশু-কিশোরদের তাঁরা তা-ই শেখান এবং বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করেন, যা তাঁরা নিজেরা ব্যক্তিজীবনে করে থাকেন। বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকই শিক্ষার নীতি-আদর্শ থেকে বণিকতন্ত্রের পেশায় শিক্ষাকে নিয়ে গেছেন। লেখাপড়া শেখা ও শেখানোর চেয়ে পরীক্ষায় ভালো গ্রেড পাওয়ার দিকে সবার লক্ষ্য ও দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ফলে শেখার বা শেখানোর দায়বোধ ও মনোবৃত্তি ক্রমেই নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। পরীক্ষায় জিপিএকে মেধার মানদণ্ড ধরায় অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেটি অর্জনেই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। পাঠ্যপুস্তক অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে, গাইড বই ও কোচিংনির্ভরতা এবং ত্রুটিতে ভরপুর পাবলিক পরীক্ষার গোলক ধাঁধায় পড়ে গোটা উঠতি জেনারেশন একটির পর একটি শেখার সাধনা থেকে ছিটকে পড়ছে।

আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান নিয়ে যত কম বলা যাবে তত বোধ হয় কষ্ট ও যন্ত্রণা কম হবে। দেশে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের অধীন দুই হাজারের বেশি স্নাতক কলেজ রয়েছে। ছয় শতাধিক কলেজে নানা বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রতিবছর চার থেকে ছয় লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে কী শেখে তা কি আমরা খবর রাখি? আদৌ সেগুলোতে

শিল্পী অনন্য মামুনের ... কয়েকজন নৃত্যশিল্পী। ... গানটিতে কণ্ঠ দিয়ে... দিহা মিম।

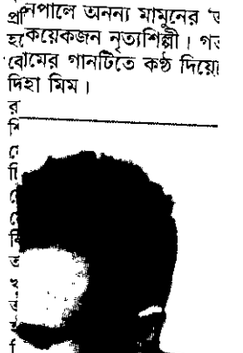

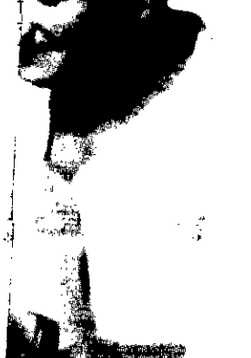

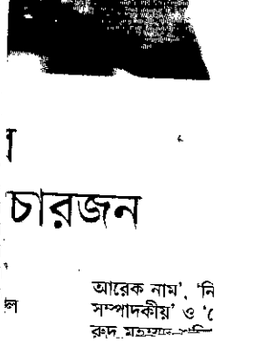

চারজন

আরেক নাম', 'নি... সম্পাদকীয়' ও '...